International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Impact Factor: 0.218 (ISRA)
Volume-I, Issue-V, June 2015, Page No. 8-12
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যান : সময়ের অন্তঃস্বর

ড. মাম্পি বৈদ্য

Abstract

The people are being rootless, homeless, and placeless due to division of the country. In consequence their children got affected in every angel of the life, they can't touch the top of the hill, and they can't cross the sea. The big problem of the young refugee child is their forefather generation; they didn't teach how to live in a proper manner in a society and the worst of them is not having an example of ideal man to run the life in his footsteps. Therefore the young mind runs their life without any direction, and even some do suicide.
The most important need of the life is to stay with time, with direction and aim, with love and gentle and also fearless at the moment of catastrophe. Then only the person will reach to the sky as the limit of success.

দেশভাগের ফলে যে সমস্ত মানুষদেরকে হতে হয়েছে ছিন্নমূল, তারা হয় নিরাশ্রয়, নিরাপদ, তাদেরই সন্তানদের জীবনের অন্তহীনভাবে সমতল ও তৃণহীন ফাঁকা,মাঠ পার হতে হয়। এই ছিন্নমূল সন্তানেরা জয় করতে পারে না কোনো পর্বতশৃঙ্গ, অতিক্রম করেনি সাগর-এই রিফিউজিদের সন্তানদের জীবনযাত্রা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কেননা, তাদের পূর্বপুরুষেরা কোনো কিছু এদের সামনে রেখে যাননি কোনো জীবনের আদর্শ। তাদের মধ্যে অনেকেই মরীচিকার আকর্ষণে পথভ্রষ্ট, উন্মাদ, কেউ আত্মহননকারী।

'শঙ্খচিলের ডানা' উপন্যাসে দেখি, দেশভাগের ফলে শঙ্খের ঠাকুরদা জীবেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই গণেন্দ্রনাথ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা থেকে পশ্চিমবঙ্গের অনতিদূরে ঈশ্বরীপুর গ্রামের আনন্দ চাটুজ্জের পতিত জমিতে বসত স্থাপন করেন। পতিত জমিতে কুঁড়ে ঘর তুলে শঙ্খের ঠাকুরদা জীবেন্দ্রনাথ শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। 'উদ্বাস্তু' শব্দটি জীবেন্দ্রনাথের কাছে ছিল অপমানের। অন্যের মুখে তাচ্ছিল্য ভরা 'রিফিউজি' শব্দটি তাঁকে বারবার আহত করেছে। দেশ দুভাগ হয়ে যেতে দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসে অনেক মানুষের জীবনে। সেই দুঃখ কষ্টের ব্যথা-বেদনা লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠে —

> "শিয়ালদহ স্টেশনে হাজার হাজার ছিন্নমূল পরিবার পড়ে রইল নিরাশ্রয় হয়ে। ... পূর্ব বাংলায় তাদের ভিটেবাড়ি ছিল, জমিজমা ছিল, সম্মান জনক পরিচিতি ছিল সমাজে নোংরা কাপড়ে, রোদে জলে, বৃষ্টিতে ভেজে অভুক্ত থেকে তাদের চেহারা হয়ে গেল ছন্নছাড়ার মতো।"[১]

দেশভাগের দায়ভার তাদের ছিল না তবুও, তিনি ওপারে অবস্থানপন্ন জীবনযাপনের অভ্যাসের প্রতিকূলে আত্মসম্মানবোধ এবং তারফলেই সৎপথ ও মাথা উঁচু করে বাঁচার ইচ্ছা ও জেদ বজায় রাখেন।

জীবেন্দ্রনাথের কোনো আয় ছিল না, বিরাট সংসারে ছেলেমেয়ে ও শঙ্খকে নিয়ে অপরিসীম লড়াই করতে হয় তাঁকে। তাতে সংসারের অভাব কোনো দিন বুঝতে দেন নি তিনি। শঙ্খের পিতা বজেন্দ্রনাথ ২০টাকা করে যে খরচাপাতি পাঠাতেন এবং জীবেন্দ্রনাথ মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে যা পেতেন তা দিয়েই কষ্ট করে তাদের সংসার চলত। তা নিয়ে জীবেন্দ্রনাথের কোনো দুঃখ ছিল না। তাই খুলনায় ফেলে আসা সম্পত্তির ভাগের কথা উঠলে তিনি সগর্বে বলেন —

"যে হাঁড়ি ফেলে দিইছি আঁস্তাকুড়ে, তা আর তুলে এনে ভাত রাঁধা যায় না।"[২]

ছোটোবেলা থেকেই শঙ্খর লেখাপড়া ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পড়েছিল জীবেন্দ্রনাথের উপর। স্নেহশীল ঠাকুরদা সবসময় চেয়েছেন শঙ্খ পরীক্ষায় প্রথম হোক। কেননা, তাঁর সমস্ত সাধ, আশা শঙ্খর উপরই ন্যস্ত করেছেন। শঙ্খ হল স্বাধীনতা বয়সী বালক। স্বাধীনতার সময়ে তার জন্ম। তাই শঙ্খকে তিনি বলেন ---

"তুই যত বড় হবি, দেশ হয়ে বড় হয়ে উঠবে তত।"[৩]

দেশ ভাগের ফলে জীবেন্দ্রনাথ ও তার পরিবারের পায়ের নীচে মাটি ছিল না বলে জীবেন্দ্রনাথ তাদেরকে শিখিয়েছেন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম।

অভাবের সংসারে জীবেন্দ্রনাথ যেখানে হিমশিম খাচ্ছেন দশ বছরের এক সরল শিশুর মন খুঁজে বেড়ায় রূপকথায়মোড়া এক স্বপ্নের পৃথিবী। রাতে ঘুমের ঘোরে সে দেখতে পায় ---

> "ঝালর দেয়া সাদা পোশাকের ফুরফুরে চমৎকার পরীদের। ইচ্ছামতীর ওপারে জল থই থই করতে থাকা, একুল-ওকুল দেখা যায় না এমন ভেড়ি, তার উপর ফুটে থাকা নালফুল, শাপলার পাতা, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একঠেঙে বক। নীলরঙের চমৎকার মাছরাঙা।"[৪]

এসব কিছুই তার কাছে রূপকথা। শঙ্খ জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে ঘোর বিরোধের দিকটি সে একবারও ভাবতে পারে না। এমনকী, ঠাকুরদার জীবনযুদ্ধের দুঃখকে সে বুঝে উঠতে পারে না বলেই, তার চারপাশে তখনও অবাধ প্রকৃতি, তার বাড়ির পাশে ইছামতী নদী, ইছামতী পেরোলে মাইল মাইল ধানবন, মাঠ, ক্ষেত, সবুজ গাছপালা, বিশাল নীল আকাশ - এই বিশাল চত্বরে লেখাপড়ার বাইরে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। কতপাখি, কতফুল, বিভিন্ন ছোট ছোট জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সে আবিষ্কার করত অন্য আরেকটি জগৎ।

তাই দেখি, শঙ্খ স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় রোজ একপথে নয়, একদিন গ্রামের এক এক পথে ফিরত। অদেখাকে দেখার, অচেনাকে চিনতে তার মধ্যে ছিল এক অসীম আগ্রহ। ফলে তার মধ্যে ধরা পড়ে —

> "একটা অন্যরকম উত্তেজনা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। ... নতুন জায়গা যাবার নাম শুনলেই সে জায়গা সম্পর্কে সে অনেক কিছু ভেবে নেয় মনে মনে। নতুন সব দৃশ্য ঘাই দিয়ে ওঠে তার মাথার ভেতর।"[৫]

এরকম হাজারও রহস্য প্রকৃতির, সবটুকু রহস্য আবিষ্কার করতে ইচ্ছে হয় তার। এমনকী, ঈশ্বরীপুর গ্রামের বাইরের এক বিশাল অজানা, অনাবিষ্কৃত পৃথিবীকে সে ধরতে চায় হাতের মুঠোয়।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় লেখক বলেন, যে স্কুলের যাওয়া-আসার পথে, গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোর একটা আলাদা মজা ছিল - 'আবিষ্কারের মজা'। স্মৃতির পিছুটান তাঁকে জড়িয়ে থাকে বলেই তিনি জানান —

> "এই যে বিভিন্ন গ্রাম দেখেছি অনুভূতি দিয়ে-এই যে গ্রামের জীবন যাপন, সমাজ ব্যবস্থা- আজও কলকাতায় এত বছর বসবাস করার পরেও বহন করে চলেছি।"[৬]

উপন্যাসে বিভূতিভূষণের অলক্ষ প্রভাব আমাদের চোখে পরে, এমনকী, পল্টন ও শঙ্খর শিকারপর্বে ইন্দ্রনাথ-শ্রীকান্তের নৈশ-অভিযানের কথাও মনে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতি-প্রেম-লোকজীবন, জীবনের আশা-নিরাশা থেকে উঠে আসা দার্শনিকতা ছুঁয়ে লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ে যে-জগৎ নির্মাণ করেন তা তাঁর নিজস্ব।

এক একটি ক্লাসে ওঠার সময় শঙ্খ ত্রাস-উল্লাসের দোটানায় তার এগারো বছরের জীবন অতিবাহিত করে। এই বিদ্যালয় কেন্দ্রিক শঙ্খর জীবনে স্বভাবতই কিছু শিক্ষকের বিভিন্ন ছাপ ফেলে। শিক্ষাগত জ্ঞান ও শিক্ষকদের ছত্রছায়ায় শঙ্খ সমাজ সচেতন হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। উপন্যাসে দেখি, আনন্দ চাটুজ্জের জমিতে উনিশ বছরের সোলেমান সাফাইয়ের কাজ করে ক্লান্ত বোধ করলে, অনতিদূরে থাকা শঙ্খদের বাড়িতে তেষ্টা মেটাতে জল চায়। সোলেমানকে জল দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র শঙ্খর ঠাকুমা খুঁজে না পেলে তাতে শঙ্খ বিরক্ত হলে, শঙ্খর ঠাকুমা বলেন—

> "জল তো দেব, কীসে করে দেব তাই তো ভেবে পাচ্ছিনে। ... আমাদের গেলাসে জল দেব কী করে ওরা তো অন্য জাত।"[৭]

শেষপর্যন্ত সোলেমান, তৃষ্ণা নিয়েই সেখান থেকে চলে যায়।

জাতিপাতের সমস্যা নিয়ে, ঠিক এরকমই একটি ঘটনা শঙ্খের সাথে ঘটে। শঙ্খ একদিন মোল্লার ঠেক গাঁ থেকে ফিরতে সময় তেষ্টা মেটাতে সামনে থাকা টিউকলের চাতালের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। সে সময় গাঁইয়ের একটি বধূ টিউকল থেকে জল তোলছিল, শঙ্খকে দেখেই সে চিৎকার করে বলল ---

> "দিলে তো জল নষ্ট করে? --- এখনো তো কলতলা থেকে নামিনি আমি, তার আগেই চাতালে উঠে পড়লে যে বড়ো? হিঁদুর ছেলে না তুমি? নামো নামো শিগগির"[৮]

পরে বধূটি ভরা কলসির জল ঢেলে জেলে দেয়। এ ধরণের ঘটনা থেকে সে বুঝতে পারে সমাজের সাম্প্রদায়িক ঘটনা সম্পর্কে তা শঙ্খকে ভাবায় পীড়িত করে।

আমরা জানি যে, ইংরেজদের বিখ্যাত নীতি থেকেই এক সময় জন্ম নেয় হিংসা, দ্বেষ। তার ফলেই জন্ম হয়েছে ছেচল্লিশের দাঙ্গা এবং তার ফলস্বরূপ পাকিস্তানের সৃষ্টি। দ্বিজাতি তত্ত্ব এভাবেই দেওয়াল তুলে দিল হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে। দেশভাগের পেছনে ছিল ---

> "দেশভাগের ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পেছনে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল হলেও তার পেছনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগী ওই শক্তিগুলির সুদূর প্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী কূটচাল ছিলো।"[৯]

এই বৃষবৃক্ষে জল সেচন করে লালন-পালন করেছে ঔপনিবেশিক সাহেবরাই। দেশ ভাগের পর কোটি কোটি হিন্দু যেভাবে থেকে গেল পাকিস্তানে, তেমনি পাকিস্তানের জন্ম হলেও কোটি কোটি মুসলমান যেত পারলনা সে দেশে। এই কোটি কোটি হিন্দু কিংবা মুসলমান না পারল নিজের ধর্মকে ভুলে যেতে, না পারল তাদের পুরনো বসতবাড়িতে প্রাণভরে বেঁচে থাকতে।

লেখক শঙ্খর বাড়ন্ত বয়সের সাথে সাথে তার চেতনায় বয়ঃসন্ধির আভাস ও লেখক রেখায়িত করেছেন। তার বাড়ন্ত বয়সকে বুঝিয়ে দিতেই লেখক কয়েকটি ঘটনার সাথে জড়িত করেন। সে জানতে পারে খেয়াঘাটের মাঝি কালোমাণিকের সঙ্গে স্বামী পরিত্যক্তা লাবনী বউ এর সম্পর্ক এবং সোলেমানের সাথে তার নতুন মায়ের সম্পর্কের কথা। অর্ঘের প্রতি স্বপ্নাদির দূর্বলতার কথা তাও শঙ্খ জানতে পারে। শঙ্খর জীবনে অর্ঘ চরিত্রটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু অর্ঘের জীবনে এক দুর্ঘটনা ঘটে যে, বন্দুকের গুলিতে তার হাতেই তার বন্ধুর মৃত্যু হয়। ফলে, ঈশ্বরীপুরে এসে উমনা ঝুমনাদের বাড়িতে নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্টভাবে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু, শঙ্খের পরিবারের সবাই এক জ্ঞাতি কাকার মাধ্যমে জানতে পারে অর্ঘের অতীতের ঘটনা। নিরীহ অর্ঘ সেই অতীতের ছায়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে ঈশ্বরীপুর থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের চেতনাবিশ্ব যেহেতু আলাদা, তার উপলব্ধি সবই আলাদা। প্রতিটি মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েনও তাই ভিন্ন।

অবশেষে বলা যায় যে, জীবনের মূলকথা এটাই যারা অস্থির সময়ে, নিরাপত্তার অভাবেও স্বাভাবিক হাসি, প্রেম ও বুদ্ধি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে তারাই শঙ্খচিল হয়ে উড়তে পেরেছে বিশাল আকাশের অনেক উচুঁতে। এখানে, জ্যোতির্ময় দত্তের ঔপন্যাসিক সম্পর্কে মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ---

> "বর্তমান বাঙালি সমাজের বৈষয়িক দীনতা বিষাক্ত কি নির্বোধ করে দিচ্ছে, নিভিয়ে দিচ্ছে আত্মার আলো ইনি প্রেমও আশাকে জাগিয়ে রাখতে সচেষ্ট।"[১০]

'শঙ্খচিলের ডানা' 'ডানার দুপাশে পৃথিবী' যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়খন্ডে বিশাল আকার করে উদ্বাস্তু সমস্যা ও খাদ্য সংকট। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী' উপন্যাসের বীজ লেখকের মাথায় আসার পেছনে মূল কারণ ছিল ---

> "যাঁরা ওপার থেকে এপারে এলেন বাধ্য হয়ে তাঁদের সামনে তখন বাঁচার। নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় বউ ছেলে নিয়ে এসে তখন প্রতিটি দিনই এক চরম অপমানের দিন। সর্বত্রই এক উপেক্ষা আর ঘৃণাভরা মুখ। তখন ইউ সি আর সি নামে উদ্বাস্তুদের এক সংগঠন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে ও সরকারের সাহায্য নিয়ে ব্যবস্থা করেছে তাদের মাথার উপর ছাউনির। গোটা পঞ্চাশের দশক তাদের এই লড়াইয়ের সময়কাল। তারাও বহুকাল পর্যন্ত নানা সমস্যা নিয়ে জর্জরিত ছিল।"[১১]

সুতরাং পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের প্রথম- এই সময়পর্বে ঘটে যাওয়া খাদ্যসংকট, উদ্বাস্তু সমস্যা ও নানা সংকট, বিপর্যয়ে ঘেরা পটাভূমিতে লেখা হয় এই আত্মজৈবনিক আখ্যানটি।

সময়ের প্রবাহমানতায় ধীরে ধীরে বালক শঙ্খ কৈশোরে পৌঁছায়। নিরাপত্তাহীন সমাজে ঠাকুরদার দেখানো পথকে অনুসরণ করে সে জীবনের পথে এগিয়ে যায়। উদ্বাস্তু জীবনের আত্মসম্মান বোধকে বজায় রাখতে, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা ও জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে খুঁজতে তার চরম আগ্রহ প্রকাশ পায় উপন্যাসে।

উপন্যাসের শুরুতেই লেখক দেশের দূরবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা দেখি যে, বৈষম্যমূলক জারি করা আইনগত কারণে সংখ্যালঘুরা তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। নিরাপত্তার অভাবে দলে দলে সংখ্যালঘুরা দেশ ত্যাগ করে। লেখক জানান ---

> "সেই ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশে একবার, তারপর পঞ্চাশে আরো একবার, এখন এই উনষাটে হিন্দুরা ওপারে বিপদগ্রস্ত। ... তাতে পশ্চিমবঙ্গে এখনও রিফিউজিদের স্রোত অব্যাহত।"[১২]

ফলে রাজ্যে খাদ্যসংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করে।

'রিফিউজি' শব্দটির সঙ্গে শঙ্খ জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই পরিচিতি। অবজ্ঞা, হীনমন্য ও তাচ্ছিল্যভরা শব্দগুলি তাকে কষ্ট দিয়েছে বারবার। যদিও বটবৃক্ষের মতো ছায়াদানকারী ঠাকুরদা মারা যাওয়ার পর তাদের অভাবের সংসারে একটু নিরাপত্তা আসে কাকাদের পরিশ্রমে। তবুও এক অসাধারণ দৈন্যতা ঘিরে থাকে শঙ্খদের সংসারে। চারপাশের সবুজ প্রকৃতি এবং ইছামতী তাকে রূপকথার জগতে ঘিরে রাখলেও তাকে বেশিদিন এভাবে রূপকথার জগতে থাকতে হয় না। সংসারের আঁচ তাকে এড়িয়ে যায় না। তাদের দুর্ভাগ্য তাকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করায়—

> "প্রতি বর্ষায় যখন ঘরের চাল ফুঁড়ে বৃষ্টির জল ভিজিয়ে দেয় তাদের বিছানা-বালিশ, এমনকী কখনও বইখাতাও, ঘরের চালের দিকে অসহায় তাকানো ছাড়া কী উপায়।"[১৩]

দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী কীভাবে দলিত মথিত করে তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই উপন্যাসটি। জীবিতকালে জীবেন্দ্রনাথের মুখে শুনতে পাই ---

> "স্বাধীনতা আমরা সবাই চেয়েছিলাম। কিন্তু স্বাধীনতা চাওয়া মানে তো বাংলা ভাগ করা নয়। এই স্বাধীনতা তো আমরা চাই নি।"[১৪]

সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক — সব মিলিয়ে সার্বিক সংকটের অবস্থান প্রত্যক্ষরূপে ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। বাজারে চালের দাম আকাশছোঁয়া, এমনকী, কালো বাজারি শুরু হয় গঞ্জের বাজারে। আমরা দেখি —

> "অস্তিত্বের সংকট যেখানে, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিতান্তই গৌণ। ...মিছিলের চেয়ে সস্তাদরে খাদ্য ও ন্যায্য মূল্যে জিনিসের দাবিতে মিছিল অনেক বেশি কার্যকর। গ্রাম ও শহর, হিন্দু ও মুসলমান তাতে সামিল।"[১৫]

সস্তাদরে খাদ্যের দাবিতে, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আন্দোলন করার অপরাধে পুলিশগুলি চালায়। এই সমাবেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ গ্রহণ করে।

উপন্যাসে আমরা দেখি, ঈশ্বরীপুর গ্রামে উপদ্রব দিনে দিনে বাড়তেই থাকে সেখানকার হিরে নামের একটি মেয়েলি স্বভাবের যুবককে ঘন ঘন ভূতে ধরে। অনেক ঝাড়ফুঁক, শিকড়-বাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র তাতে কোনো কাজ হয় না। বরং, হিরে চরিত্রটির পরিবর্তন ঘটে। তার নরম মেয়েলিভঙ্গিতে ধরা পড়ে এক ভয়ঙ্কর দৃষ্টি। হিরেদার ঘাড়ে চাপে স্বাধীনতা সংগ্রামী দিনুবাবুর ভূত। সে বলে ---

> "দেশের সব্বেনাশ হয়ে গেল। ধানচাল যদি চোরাকারবারীর মাল হয়, তবে দেশের আর রইলটা কী! কী বলিস কি তোরা! ধান স্মাগল হচ্ছে বাসে ট্রামে!"[১৬]

উপন্যাসে পাঠের প্রথমে হিরের ঘাড়ে বারবার ভূত ধরার কাহিনি আমাদেরকে, হাসির যোগান দিলেও পরবর্তিতে আমরা বুঝতে পারি যে, আসলে উপন্যাসে 'ভূত' রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমাজে অরাজকতা শুরু হলেই ভূতের উপদ্রব বেড়ে যায়। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটের বোঝাতে ঔপন্যাসিক এই রূপক ব্যবহার করেন। ভূতগ্রস্ত হিরেদার মুখে শুনতে পাই —

> "দুবেলা দুমুঠো ভাত জোগাবে গবরমেন্ট তাও পারছে না!"[১৭]

কালোবাজারির ফলে মানুষের কাছে ধান এমন এক অদ্ভুত বস্তু হয়েছে যে, ধানের দাম সোনার দামের চেয়েও বেশি খাদ্যসংকটে সব শ্রেণীর মানুষের একই দূরবস্থা। উপন্যাসে এরকমই একটি পাই —

"একটু নিচু সম্প্রদায়ের মহিলারাও ছোটো পুটুলি কাপড়ের নীচে বেঁধে চেপে বসছে লোকাল ট্রেনের কামরায়।"[১৮]

উপন্যাসের অন্যদিকে দেখি, শিখরবাবুর মুন্ডহীন দেহ আবিষ্কার, সেলাই মিস্ট্রেসের অস্বাভাবিক মৃত্যু তে ঈশ্বরপুরী অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ, অরাজকতা চলছে-এরই মধ্যে আমরা খুঁজে পাই অবন বুড়োকে যে ঈশ্বরের সন্ধান করে চলেছে অবিরাম, শান্তির পরিবেশ আনতে।

সুতরাং, সময় উপন্যাসের আধার ও আধেয়—এই সাধারণ সত্যকে বড়ো মাপের ঔপন্যাসিক কতখানি পরিশীলিত করতে পারেন তা দেখি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শঙ্খচিলের ডানা', 'ডানার দুপাশে পৃথিবী'তে। এই সময় লেখককে দিয়েছে অন্তর্ভেদি চোখ যা দিয়ে তিনি বাস্তবতার ভেতরকার বাস্তবতাকে দেখতে ও দেখাতে পেরেছেন। কালের সন্ধিক্ষণে যখন সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যথাপ্রাপ্তকে অটুট রাখা তখন খুব কঠিন। তবু যে যেমন তাকে রেখেই লেখককের কল্পনাপ্রতিভা সম্ভাবনার জায়গাটি অক্লান্তভাবে খুঁজে গেছে। এই সন্ধানের ফলশ্রুতি সময়ের বহুস্বরিক অভিযানে ঋদ্ধ উপন্যাস দুটি।

উল্লেখসূত্র :

১। বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'শঙ্খচিলের ডানা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৭।
২। 'শঙ্খচিলের ডানা', অনুরূপ, পৃঃ ২৫।
৩। 'শঙ্খচিলের ডানা', অনুরূপ, পৃঃ ২২১।
৪। 'শঙ্খচিলের ডানা', অনুরূপ, পৃঃ ৪০।
৫। 'শঙ্খচিলের ডানা', অনুরূপ, পৃঃ ৭৪।
৬। সম্পাদক : মন্ডল ইসলাম, 'সমকালের জীয়নকাঠি', কলকাতা, প্রকাশকাল-২০১১, পৃঃ ৬৩৬।
৭। 'শঙ্খচিলের ডানা', অনুরূপ, পৃঃ ৮৬।
৮। 'শঙ্খচিলের ডানা', অনুরূপ, পৃঃ ৯১।
৯। ভট্টাচার্য মিহির, 'ভাষা জাতি ও রাষ্ট্র', একুশে, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ-২০০৩, পৃঃ ৭৯।
১০। সম্পাদক : দত্ত জ্যোতির্ময়, 'কলকাতা' পত্রিকা, কলকাতা-৩৩, প্রথম প্রকাশ-১৯৭২, পৃঃ ১১।
১১। একান্ত সাক্ষাৎকার।
১২। বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-২০০৬, পৃঃ ২৯।
১৩। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', অনুরূপ, পৃঃ ৭২।
১৪। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', অনুরূপ, পৃঃ ১৩৭।
১৫। সেনগুপ্ত অমলেন্দু, 'জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর', পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পৃঃ ৫৭।
১৬। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', অনুরূপ, পৃঃ ৯৭।
১৭। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', অনুরূপ, পৃঃ ১০৬।
১৮। 'ডানার দুপাশে পৃথিবী', অনুরূপ, পৃঃ ১৯০।
১৯। 'সাহিত্য চলচ্চিত্র এবং .....', পৃঃ ২২।

*****